# নাগরিক ভারতে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পর্কে অন্বেষণঃ নির্বাচনী সংযোগ

নিখার গায়কোয়াড় ও গ্যারেথ নেলিস

২৬ অক্টোবর, ২০২০

ভারতে কোভিড 19-এর কারণে ঘটা লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁরা এ দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে একটা বড় অংশ, তাঁদের অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়। ভিন্‌রাজ্য থেকে নিজের বাড়ি ফিরতে এবং অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন। ভারতে এখন দ্রুতগতিতে নগরায়ন ঘটছে এবং তার ফলে কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ শহর ও নগরগুলিতে চলে আসছেন। ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই ডেমোগ্রাফিক বা জনপরিসংখ্যানগত পরিবর্তনের গুরুত্ব নিয়ে খুব বেশি সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও, অতিমারীর শুরুর দিকের দিনগুলিতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই চলমান গোষ্ঠীর প্রতি আসলে কতটা কম মনোযোগ দেওয়া হয়।

আর এই ঘটনা যে এই প্রথম এবং শেষ বারই ঘটল তাও নয়। উত্তরপূর্ব ভারতের পরিযায়ী শ্রমিকরা মূল ভূখন্ডের যে শহরেই কাজ করতে গেছেন সেখানেই তাঁরা কি ধরনের শত্রুতাপূর্ণ আবহাওয়ার মুখোমুখি হয়েছেন ২০১৪ সালের ‘বেজবড়ুয়া রিপোর্ট’ তা আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। সাম্প্রতিককালে, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ অনেক রাজ্যই জন্মসূত্রে সেই রাজ্যের বাসিন্দাদের কাজ পাওয়ার সুযোগ নিরাপদ করতে এবং বহিরাগতদের কাজের সুযোগ পাওয়া থেকে নিরস্ত করতে ‘শুধুমাত্র স্থানীয় শ্রমিকদের’ জন্য সংরক্ষণ চালু করেছে। মেরি কাটজেনস্টাইন এবং মায়রন ওয়েনার ১৯৭০ সালেই ভারতের ‘ভূমিপুত্রদের’ পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলির পরিযায়ী শ্রমিক বিরোধী কর্মপন্থা নিয়ে বিশদে লিখেছেন।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় চুক্তির দিক থেকে দেখলে, এই সবকটি উদাহরণই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির ইঙ্গিত। এগুলি থেকে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে সেই প্রশ্নগুলিই আমাদের গবেষণার আলোচ্য বিষয়কে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিযায়ী শ্রমিকরা যে বৈষম্যের শিকার তা ঠিক কতটা তীব্র ও সংগঠিত? ঠিক কোন শ্রেণীর পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজেদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের প্রান্তেই থেকে যান? কিসের তাড়নায় পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি এই অসম আচরণ করা হয়?

## পূর্ববর্তী নানা গবেষণা থেকে উঠে আসা কিছু তত্ত্ব

যে বিষয়গুলি আভ্যন্তরীণ পরিযাণ নিয়ে জনমতকে পরিচালনা করে সেগুলিকে বোঝাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। স্থানীয় মানুষরা কেন নতুন আগন্তুকদের প্রতি বিরূপ, তার প্রধান কারণ হিসেবে এর আগে সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণাগুলি দুই প্রস্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে। প্রথমত, বিদেশিদের প্রতি অহেতুক ভয় ও সুগভীর ঘৃণা বা জেনোফোবিয়া। এই প্রথম কারণটি বহিরাগতদের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতির ভূমিকাকে সামনে এনে দেয়। এই মনোভাব থেকেই স্থানীয় মানুষরা নিজেদের অধিকৃত নাগরিক সমাজের প্রচলিত সাংস্কৃতিকবৈশিষ্ট্য ও জাতিগতবিন্যাস বা এথনিক মেকআপকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। বহুসংখ্যক পরিযায়ী মানুষ যদি ওই অধিকৃত অংশে ঢুকে পড়েন তাহলে জাতি ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসে ‘শিথিলতা’ তৈরি হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। এদিকে দ্বিতীয় কারণটি আবার জোর দেয় আথনীতিক উদ্বেগের উপর। ভারতে বেকারত্বের হার এখনো অনেক বেশি। কাজের খোঁজে এক রাজ্যের শ্রমিক অন্য রাজ্যে এসে শ্রমের বাজারে প্রবেশ করলে স্থানীয় মজুরির হার কমে যাবে বা স্থানীয় শ্রমিকরা তাঁদের কাজ হারাবেন এরকম একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। এরকমও হতে পারে যে, পরিযায়ী শ্রমিকরা হয়ত রাজস্বের তহবিলে খুব বেশি কিছু জোগান দেবেন না অথচ অনেক অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা নিয়ে নেবেন।

আমরা দেখব যে, এই বিষয়গুলির গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু এরা পুরো গল্পটা বলে না। দেশের আভ্যন্তরীণ পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে একটি মুখ্য বিষয়ে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটি হল, আভ্যন্তরীণ পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটাধিকার যা কিনা ভারতীয় সংবিধান দ্বারা সযত্নে লালিত। তাঁরা যে রাজ্যেই যান না কেন তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকার কখনোই ক্ষুণ্ণ হয় না। ভারতের মত ঘটনাবহুল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক গণতন্ত্রে সব সময়ই ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিযায়ী শ্রমিকদের সুবিশাল সম্ভাবনা আছে। সম্ভাব্য ভোট ব্যাংক হিসেবে তাঁদের এই অবস্থানই নির্ধারণ করে দেশের নাগরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা পরিযায়ী শ্রমিকদের আত্মীকরণের পক্ষে না বিপক্ষে কাজ করবেন তার সিদ্ধান্তকে।

**সংগৃহীত প্রমাণ ও তার উপস্থাপনাঃ পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষরা কি ভাবেন?**

আমাদের প্রথম নিরীক্ষার জন্য আমরা মুম্বাইকে বেছে নিয়েছিলাম। এই শহরকে বলা যেতে পারে ভারতের আদি দেশজ জীবনচর্চার মতাদর্শে বিশ্বাসী বা নেটিভিস্ট রাজনীতিচর্চার কেন্দ্রস্থল আর শিব সেনা আর তার শাখা মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার খাস জমি। সাম্প্রতিককালে যে পরিযায়ী শ্রমিকরা মুম্বাইতে কাজের খোঁজে এসেছেন তাদের প্রতি মুম্বাইকারদের মনোভাব ঠিক কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় তা বোঝার জন্য শহরের মানুষদের প্রতিনিধি হিসেবে কিছু নমুনা বেছে নিলাম ও তাঁদের মধ্যে একটি সমীক্ষামূলক গবেষণা পরিচালনা করলাম। তাঁদের সামনে একজন করে কল্পিত পরিযায়ী শ্রমিকের বর্ণনা তুলে ধরা হল। এই কল্পিত শ্রমিককে সুদক্ষ বা দক্ষতাহীন কর্মী হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং তাঁকে হিন্দু বা মুসলিমনামে শনাক্ত করা হয় (অন্তত ১৯৯০ সালের বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে দাঙ্গার পর থেকেই মুম্বাইতে গোষ্ঠীপরিচয়ের মধ্যে বিভেদের বেড়া তুলে দেওয়ার জন্য ধর্মই প্রধানত দায়ী। এরপর আমরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম যে তাঁরা এই পরিযায়ী শ্রমিককে শহরে থাকতে দেবেন কিনা এবং ওই শ্রমিক মুম্বাইতে ভোট দেওয়ার অনুমতি পেলে তা তাঁরা সমর্থন করবেন কিনা।

এই নিরীক্ষার ফলাফল, পরিযায়ী শ্রমিক বিরোধী মতামতকে সমর্থনের কারণ অর্থনৈতিক – এই যুক্তিরই বৈধতা প্রমাণ করে। সামগ্রিকভাবে, অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ শ্রমিক নয়, বরং সুদক্ষ শ্রমিকদের প্রতিই জনমত অনেক বেশি অনুকূল। যদিও লক্ষণীয় বিষয় হল, স্বল্পদক্ষ উত্তরদাতাই আবার স্বল্পদক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি বিরূপ। এই উত্তরদাতারা হলেন সেই শ্রমিকরা শ্রমের বাজারে যাঁদের অবস্থান অনিশ্চিত এবং যাঁরা সরকারি পরিষেবার উপর সব চেয়ে বেশি নির্ভরশীল। সুতরাং, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদান সম্বন্ধে ন্যায্য উদ্বেগই পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি বিরূপতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে।

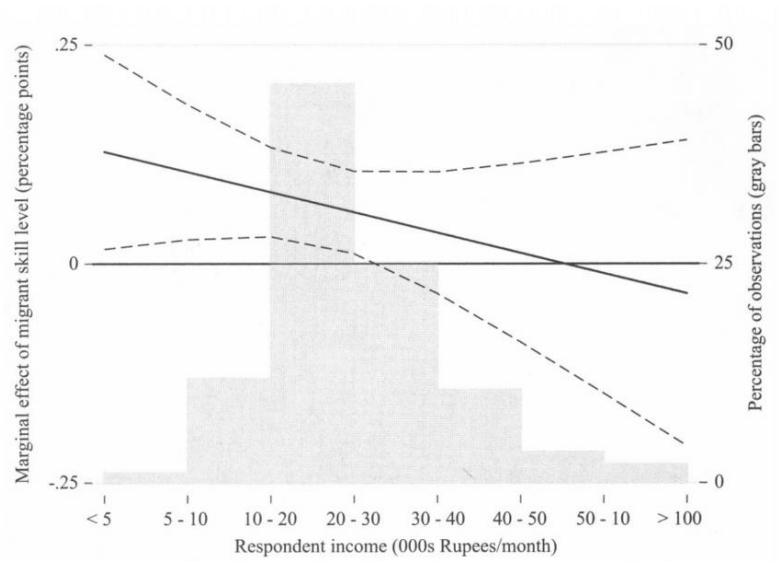

*মুম্বাই-এর স্বল্প আয়ের উত্তরদাতারা বিশেষ করে দক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের মনোনীত করছেন। উচ্চ আয় সম্পন্ন উত্তরদাতারা এ বিষয়ে নিস্পৃহ।*

পরিযায়ী শ্রমিকের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরে নানা অসামঞ্জস্য দেখা গেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্তরদাতাদের মধ্যে কোন জাতি ও সংস্কৃতিভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব দেখা যায় নি। তাঁরা পরিযায়ী শ্রমিকদের ধর্মপরিচয় নিয়েও বিব্রত নন। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রবলভাবে স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। তদুপরি, মুম্বাইতে দীর্ঘদিন বসবাসকারী মুসলিমরা হিন্দু পরিযায়ী শ্রমিকদের দক্ষতার মান বিবেচনা করেছেন কিন্তু মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের দক্ষতার পরিমাপ তাঁদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক।

এই তথ্যগুলি বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি যে, গোষ্ঠীর নির্বাচনী ক্ষমতা গুরুত্বকে বিবেচনা করার প্রবণতাকে বিচার করলেই সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু বিভাজন করার যে মনোভাব তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় মুসলিম উত্তরদাতাদের মধ্যেই স্বজাতির প্রতি বেশি পক্ষপাত দেখা গেছে। এছাড়াও, বিশেষভাবে মুসলিম (হিন্দুদের বদলে) পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্বাচনী পরিকল্পনায় সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যা মুসলিম উত্তরদাতাদের মধ্যেই বেশি। নাগরিক জীবনে এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অবস্থান দুর্বল এবং প্রশাসনিক বা সরকারী ক্ষেত্রের সমস্ত এলাকাতেই তাঁদের উপস্থিতি নামমাত্র। এর থেকেই মনে হয় যে স্বজাতিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের আগমনকে স্বাগত জানানো আসলে 'বড় দলে থাকা মানে সুরক্ষিত থাকা' – এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায়।

**রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও কি পরিযায়ী শ্রমিক-বিরোধী মনোভাবের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট?**

আমাদের মুম্বাই কর্মসূচী পরিযায়ী এই শহরে এসে পড়া শ্রমিকদের নতুন নতুন ঢেউ সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিক্রিয়ার উপর আলোকপাত করেছে। তবে, জনমতকে প্রভাবিত করার রাস্তাটি, পরিযায়ী শ্রমিকদের বর্জন করার যে সহজতম প্রক্রিয়াটি আছে তার মাত্র একটি দিক। অন্ততপক্ষে একই রকমভাবে জরুরি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মনোভাব ও আচরণ। আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে, যে পরিষেবা প্রদানকারীরা এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সামনের সারিতে থেকে কাজ করছেন তাঁরা পরিযায়ী শ্রমিকদের থেকে মুম্বাই-এর দীর্ঘকালের বাসিন্দাদের কম সুবিধা দিচ্ছেন কিনা। এরকম ঘটনা যে সম্ভব তার সপক্ষে কিছু প্রবল যুক্তি পেয়েছি আমরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতোই, রাজনীতিবিদরাও বহিরাগতদের নিয়ে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারেন। তাঁরা শহরের দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক পছন্দ অপছন্দগুলিকেও চালিত করতে পারেন। তাহলে আরো একবার রাজনৈতিক কলাকৌশল এই অঙ্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আমরা ধরে নিই যে, সাহায্যপ্রার্থী নাগরিকদের সহায়তা করা ও তাঁদের যা মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ সহায়তার ফলে ওই নাগরিকরা ভোট দিয়ে তাঁদের নির্বাচনে জেতাবেন – রাজনীতিবিদরা এই দুটি ঘটনাকে পরস্পরের বিপরীতে দাঁড় করান ও সেগুলির মূল্য বিবেচনা করেন। যেহেতু, অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিকই শুধুমাত্র কাজের মরশুমে শহরে আসেন আর প্রতিবার নতুন কোন শহরে গিয়ে সেখানকার ভোটদাতা হিসেবে নিজেদের নাম আবার নথিভুক্ত করানো বেশ ঝামেলার বিষয় তাই রাজনীতিবিদদের আশঙ্কা হতেই পারে যে দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক ভোট দিতে চাইবেন। তাই, রাজনীতিবিদদের এই আশঙ্কা যদি সত্যি হয় তাহলে শ্রমিকরা কোন রকম সাহায্যের জন্য আবেদন জানালে রাজনীতিবিদদের দিক থেকে অনিরপেক্ষ ব্যবহার পাওয়ার সম্ভাবনাই তাঁদের বেশি।

এই দাবিগুলির মূল্যায়ন করার জন্য আমরা একটি পরীক্ষামূলক গবেষণা চালু করলাম। আমরা আঠাশটি শহরের পৌরসভার নির্বাচিত সদস্য বা কাউন্সিলারদের উদ্দেশ্যে ২,৯৩৩টি চিঠি পাঠালাম। প্রতিটি চিঠিতে তাঁদের নির্বাচিত এলাকায় সাধারণভাবে দেওয়া হয় এমন যে কোন একটি পরিষেবার সম্বন্ধে সাহায্য চাওয়া হয়। এই সাধারণ পরিষেবার উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, রাস্তার আলো ঠিক করা বা আয়ের প্রমাণপত্রের ব্যবস্থা করা। চিঠিগুলিতে সাহায্যপ্রার্থী (কাল্পনিক)

নাগরিকের সম্বন্ধে বিভিন্ন পরিচিয়জ্ঞাপক তথ্য দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি দেওয়া হয় তা হল, এদের মধ্যে অর্ধেক অংশ নিজেদের শহরের 'আদি বাসিন্দা' যাঁরা সারা জীবন ওই শহরেই বসবাস করেছেন বলে চিহ্নিত করেন এবং বাকিরা 'ভারতের অন্য কোন রাজ্য থেকে এই শহরের এসেছেন' বলে জানান। চিঠির শেষে একটি স্থানীয় টেলিফোন নাম্বার দেওয়া হয় এবং ফোন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

দেখা গেল যে, তথাকথিত আদি বাসিন্দাদের অনুরোধের উত্তরে কাউন্সিলারের কাছ থেকে ফোন পাওয়ার সম্ভাবনা তথাকথিত পরিযায়ী শ্রমিকদের থেকে অনেক বেশি – দুটি প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য চব্বিশ শতাংশের। এর থেকে মনে হয়, পরিযায়ী শ্রমিকদের যেকোনো রকম সাহায্যের বৃত্তের বাইরে রেখে দেওয়া আদতে একটি সংগঠিত ঘটনা এবং এই বিষয়টি ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিতে উপেক্ষিতই হয়ে আছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল যে, এই নিরীক্ষার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে রাজনীতিবিদরা আসলে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি কোন নিজস্ব কারণে শত্রুভাবাপন্ন এমন নয় বা তাঁরা তাঁদের এই ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে আদি দেশজ জীবনচর্চার মতাদর্শে বিশ্বাসী স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামতের প্রতিধ্বনিও করছেন না।

বরং, এর কারণ হিসাবে সাক্ষ্য তথ্যগুলি সোজাসুজি নির্বাচনে জয়লাভের ব্যাখ্যাটিকে নির্দেশ করে। এই সমীক্ষাটির প্রেক্ষিতে পরবর্তী অডিটে এসএমএসের টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে আমরা আদি বাসিন্দা/পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যপ্রার্থীদের সামাজিক অবস্থান শুধু নয়, তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানও বদলে দিলাম। সর্বোপরি যে তথ্যটি দেওয়া হয় তা হল, তাঁরা স্থানীয়ভাবে ভোট দেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন কিনা। এই বিশেষ তথ্যটি তাঁদের আবেদনের প্রতিক্রিয়ায় অভূতপূর্ব প্রভাব ফেলে। 'নথিভুক্ত' পরিযায়ী শ্রমিকরা যে শুধু 'অনথিভুক্ত' পরিযায়ী শ্রমিকদের চেয়ে বেশি সাড়া পান তা নয়, তাঁদেরকে 'নথিভুক্ত' আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে সমানভাবেই দেখা হয়। অন্যভাবে দেখলে, ভোটের জন্য নাম নথিভুক্ত করার ফলে পরিযায়ী শ্রমিক বিরোধী মনোভাব থেকে সাধারণত যে বিরূপতা তৈরি হয় তা অদৃশ্য হয়ে যায়।

আদি বাসিন্দাদের তুলনায় কমসংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন – এই বিশ্বাস থেকে রাজনীতিবিদরা তাঁদের অবহেলা করেন কিনা তা চূড়ান্তভাবে বোঝার জন্য রাজনীতিবিদদের থেকেই একটি বাছাই করা অংশে একটি ছোট সমীক্ষা চালানো হয়। এই সমীক্ষায় একজন কাল্পনিক নাগরিকের বর্ণনা দেওয়া হয় এবং শুধু জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভোটদাতা হিসাবে এই রকমের একজন নাগরিককে তাঁদের নির্বাচন এলাকায় নথিভুক্ত করা হবে কিনা। যে রাজনীতিবিদদের কাছে ওই নাগরিককে স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে পেশ করা হয়েছে তাঁরা অনেকেই ওই নাগরিককে নিজের এলাকার ভোটার হিসাবে নথিভুক্ত করতে রাজি হন। যে রাজনীতিবিদের কাছে একজন পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ওই নাগরিককে বর্ণনা করা হয়েছে এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের উত্তর ও প্রথম দলের রাজনীতিবিদদের প্রতিকূল উত্তরের মধ্যে পার্থক্য গড়ে ছেচল্লিশ শতাংশ বেশি।

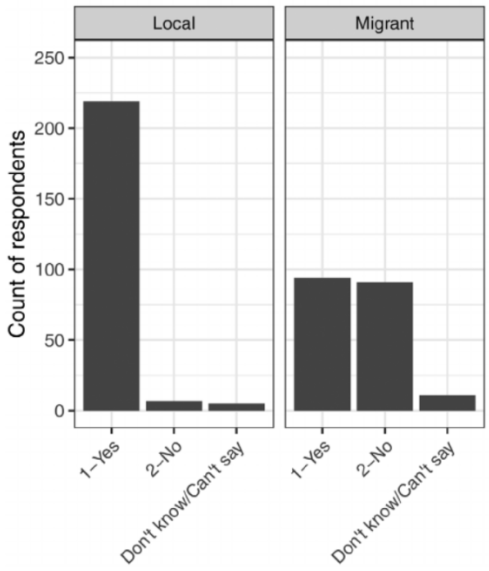


*শহরাঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের নাগরিকরা ভোটের জন্য নথিভুক্ত কিনা তা নিয়ে কাউন্সিলারদের মতামত*

**এর পর কি?**

এই সমীক্ষাগুলি থেকে পরিষ্কারভাবে পরবর্তী কর্মপন্থা কি হতে পারে তার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভোটে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপস্থিতির হার কম বলে প্রচলিত ধারণাটি যে তাঁদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে সে বিষয়ে ওই শ্রমিকদের এবং এবং যাঁরা এই পরিযায়ী গোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করছেন তাঁদের সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের সকলে দল বেঁধে শহরের নির্বাচনের জন্য নাম নথিভুক্ত করলে এবং এই ঘটনাকে জনসাধারণের গোচরে আনলে তা পরিযায়ী শ্রমিকদের হিত ও উন্নতির ক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব ফেলবে। নির্বাচনে নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে সহজ করে দিলে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এই প্রক্রিয়া কম কষ্টসাধ্য হবে। যে সব শহরে পরিযায়ী শ্রমিকরা সাধারণত কাজ করতে যান সেখানকার কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি এবং অনেক স্থানীয় বাসিন্দা, বিশেষত যাঁরা অদক্ষ শ্রমিক, কাজ পাওয়া নিয়ে তাঁদের মনে যে গভীর নিরাপত্তাহীনতা থাকে তার উপর নতুন করে মনোযোগ দিতে হবে। তাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পরিস্থিতি হয়ত বদলাবে না, কিন্তু শহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে জীবিকার সুযোগ বাড়বে।

এখানে বলে রাখা উচিত যে, আমাদের সমীক্ষার ফলাফল একটি অগ্রপশ্চাৎহীন শূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই সমীক্ষাটি শহরের অসংগঠিত জীবনচর্যা (উদাহরণ, অ্যাডাম আউরবাক আর তারিক থাচিলের কাজ), রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকদের দাবি (জেনিফার বুসেল আর গ্যাব্রিয়েল ক্রুক্স-ওয়াইসনার), নির্বাচনে ভারত ও ভারতের বাইরে বসবাসকারী সব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহদান – এই ধরনের বিষয় নিয়ে অগ্রগণ্য কিছু গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত। কোন কোন বিন্দুতে গণতন্ত্রের সঙ্গে এই সর্বদা চলমান গোষ্ঠীগুলির  মিলন হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা যতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি ভবিষ্যতের গবেষণামূলক কাজগুলিকে সেই জ্ঞানে আরো তথ্য ও তত্ত্ব যোগ করার কথা মাথায় রাখতে হবে।

*নিখিল গায়কোয়াড় কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অ্যাসিস্ট্যান্ট অধ্যাপক।*

*গ্যারেথ নেলিস সান ডিয়েগোর ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়াতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অ্যাসিস্ট্যান্ট অধ্যাপক।*